জনগণ মেষ রাশির জাতক

অনাবিল সিদ্ধান্ত

সুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

গ্রন্থ প্রসঙ্গে

গল্পে আছে, একদা এক বাঘের গলায় একটি হাড় ফুটেছিল। এমনই এক অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছিল এক পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদকের জীবনে। ওই পত্রিকার মালিক সম্পাদককে 'গাজন'-এর ওপর একটি বিশেষ সংখ্যা বের করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই নির্দেশ সম্পাদককে গলার কাঁটার মতো অস্বস্তিতে ফেলেছিল। গাজন আসন্ন, হাতে সময় খুব কম; অথচ 'গাজন'-এর ওপর কোনো লেখা পাওয়া যাচ্ছে না। পত্রিকার দপ্তরে গিয়ে সম্পাদক শ্রীমণীন্দ্র ঘটকের বিপন্ন বিষণ্ণ মুখ দেখে জানতে চাইলাম, 'কী ব্যাপার, ঘটকবাবু? এমন বেজার দেখাচ্ছে কেন?'

ঘটকবাবু তাঁর সমস্যার কথা বললেন। এর পর এক অবিশ্বাস্য প্রস্তাব করে বসলেন। ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো ধরে ভেসে থাকতে চায় তেমনি তিনি আমাকে বললেন, 'অনাবিল, তুমি একটা লেখা দাও।' প্রস্তাব শুনে সম্পাদকের এমন শোচনীয় পরিস্থিতিতেও আমার হাসি পেল। আমি লিখব গাজন সম্পর্কে! গাজন সম্পর্কে আমি তো কিছুই জানি না। কিন্তু, পরমুহূর্তেই আমার মনে হল, গাজন সম্পর্কে আমি একেবারে কিছু জানি না তা ঠিক নয়। আমি অন্তত একথা জানি যে, 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট'। এই লাইনটার ভাবসম্প্রসারণ করে একটা রচনা দাঁড় করানো যায় না? একথা মনে হতেই আমি ঘটকবাবুকে বললাম, 'আমার মাথায় একটা ওয়াইল্ড আইডিয়া এসেছে। কাগজ-কলম নিয়ে বসব। যদি লেখা দাঁড়ায় তবে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই লেখাটা দিতে পারব। না হলে আমি নিরুপায়।'

বাড়ি ফিরে কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম। লাগাম ছাড়া কল্পনায় চলে গেলাম এক গাজনের মেলায়। সেখানকার নানান কাল্পনিক অভিজ্ঞতার বর্ণনায় লেখাটা সন্তোষজনকভাবেই শেষ হল। লেখাটা পড়ে সম্পাদক খুশি হলেন। 'গাজন সংখ্যা' উৎরে গেল। ওই সংখ্যাতেই লেখক হিসেবে অনাবিল সিদ্ধান্তের প্রথম আত্মপ্রকাশ। মনীন্দ্র ঘটকের সম্পাদিত ওই সংখ্যায় প্রকাশিত 'শিবসঙ্গ মেড-ইজি' শীর্ষক রচনাটিই আমার প্রথম রচনা। প্রথম লেখাটাই শেষ লেখা হতে পারত। তা যে হয়নি তার কারণ সম্পাদকবন্ধু মনীন্দ্র ঘটকের খোঁচানি। তাঁর খোঁচায় অতিষ্ট হয়ে আরও দু-চারটে লেখা লিখতে হয়েছিল। কিন্তু ঘটকবাবুর খোঁচানি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, কেননা অচিরেই ওই পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেল।

এরপর দীর্ঘদিন লেখার কোনো তাগিদ ছিল না। অন্তরের তাগিদও ছিল না, বাইরের

কোনো খোঁচানিও না। সাতটি বন্ধ্যা বছর কাটার পর কী করে জানি না হঠাৎ একটা লেখা কেমন করে যেন হয়ে গেল! সাহস করে লেখাটা দিয়ে এলাম সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষের হাতে।

এরপরই অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার ঘটে গেল। ১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাসে আমার লেখাটা ছাপা হল 'দেশ' সাপ্তাহিক-এর রম্যরচনার ওপর বিশেষ সংখ্যায়! উৎসাহিত হয়ে আর একটি লেখা নিয়ে হাজির হলাম সাগরময় ঘোষের কাছে। পরিচয় দিতেই তিনি বললেন, 'আপনার লেখা পড়ে অনেকে আমাকে ফোন করে জানতে চেয়েছেন আমাদের হাউসের কে অনাবিল সিদ্ধান্ত ছদ্মনামে লিখেছেন।'

এরপর তিনি বললেন, 'আপনি সাপ্তাহিক দেশ-এ সিরিয়াল লিখুন। প্রথমে ছটা লেখা জমা দিতে হবে। তারপর প্রতি সপ্তাহে একটা করে লেখা দিয়ে যাবেন।'

সাগরময় ঘোষের মতো সম্পাদক আমাকে এমন প্রস্তাব দিতে পারেন এ বিশ্বাস আমার ছিল না। বলা বাহুল্য, আমি তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম। তাঁকে বললাম, 'আমি পনের দিন সময় নিচ্ছি। এর মধ্যেই ছ'টা লেখা জমা দিয়ে যাব।'

আমি কথা রাখতে পেরেছিলাম। দু'সপ্তাহের মধ্যেই ছটা লেখা দেশ পত্রিকার দপ্তরে জমা দিয়ে এসেছিলাম। এরপর, ছমাস ধরে দেশ সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় আমার লেখা বেরিয়েছে। ছ'মাস পরে সাগরময় ঘোষ আমায় বললেন, 'রূপদর্শী ফিরে এসেছেন। তাই, আপাতত আপনার সিরিয়াল লেখা বন্ধ করতে হচ্ছে।'

বর্তমান সংকলনের সিংহভাগ লেখাই 'দেশ' সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়েছিল। ওই পত্রিকার প্রয়াত সম্পাদক সাগরময় ঘোষ আমার প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছিলেন বলেই এসব রচনা লিখে উঠতে পেরেছি। তাই, তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। গাজন-বিপন্ন সম্পাদক মনীন্দ্র ঘটকও কিছুদিন হল প্রয়াত হয়েছেন। একথা বলেছি, তাঁর বিপন্নতাই আমার প্রথম রচনার নেপথ্য প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। তাই, তাঁর স্মৃতির প্রতিও আমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বর্তমান সংকলনের লেখাগুলি নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছেন আমার স্নেহভাজন শ্রী শৈলেন চক্রবর্তী। তাঁর এই সাহায্যের কথা আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করছি। লেখার সঙ্গে কার্টুনচিত্রের যুগলবন্দী ঘটিয়ে বইটির অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছেন নিপুণ চিত্রকর শ্রী সরোজ সরকার। তাঁকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সূচিপত্র

জনগণ মেষ রাশির জাতক ৯

গণপতির গজমুণ্ড ১২

ইতিহাস ১৫

বুদ্ধিজীবী ১৮

সত্যাসত্য ২১

শিশুশিক্ষার বুনিয়াদ ২৩

মানুষ গৃহপালিত ত্রিপদ ২৬

সব্যসাচী এবং ত্রিশঙ্কু ২৯

অল্পবিদ্যা শুভঙ্করী ৩২

বিবর্তনবাদের আলোয় ৩৬

বন্দে দাদরম্ ৩৯

গট আপ ৪১

সত্য-মিথ্যা এবং পুলিশ-বিভাগ ৪৩

গেঁজানো দ্রাক্ষারস এবং চিত্রকলা ৪৬

কলকাতার উন্নতি-সাধক ৪৯

স্বরচিত রবীন্দ্রসাহিত্য ৫২

কমরেড রবীন্দ্রনাথ ৫৫

রবীন্দ্রনাথের আমবাত ৫৮

সাম্প্রতিক রবীন্দ্র-গবেষণা ৬০

মা লক্ষ্মীর বাহন ৬২
প্রেমের গুড়ত্ব ৬৫
বিবাহের ব্যাসবাক্য ৬৭
ভালোবাসা চার তাস ৭০
আইন ৭২
বাঙালির খাদ্যভ্যাস ৭৪
জীবনের অন্য নাম মৃগয়া ৭৬
যোগ বিয়োগ ৭৯
প্রেমিকের রকমফের ৮৪
মন্ত্রী ও মশা ৮৮
শিবসঙ্গ মেইড-ইজি ৯৩
জলো লেখা ১০২
ইঁদুর এবং লেখক ১১৭
একস্ট্রা টেরিস্ট্রিয়াল লোকাল কল ১২৩

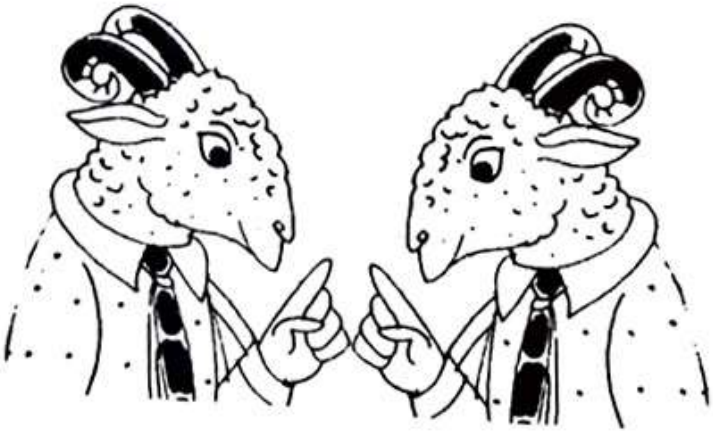

জনগণ মেষ রাশির জাতক

জ্যোতিষশাস্ত্র মতে মানুষেরা সবাই জাতক। বুদ্ধও জাতক, বুদ্ধুও জাতক। আমরা কেউ মেষ রাশির জাতক, কেউ বৃষ রাশির; কেউ সিংহ রাশির জাতক, কেউ মীন রাশির। কিন্তু, জ্যোতিষীর বিচারে যে-জাতক সিংহ সে-জাতক যে সর্বক্ষণই সিংহের তো রাজকীয় মেজাজে বিচরণ করে, তর্জন-গর্জন করে এমন নয়। জন্ম-কুণ্ডলীর সাক্ষ্য অনুসারে যে-জাতক মীন সেও সর্বক্ষণ শফরীর মতো অগভীর জলে ফর ফর করে না। সময়বিশেষে

সেও হয়ে ওঠে গভীর জলের মাছ। মীন রাশির জাতক যদি কোনো অফিসের বড়বাবু হয় তাহলেও অফিসের চৌহদ্দিতে সে সিংহ। আবার, সে অফিসের কনিষ্ঠ কেরানিবাবুটি যদি সিংহ রাশির জাতক হয় তবু সে তার ঊর্ধ্বতন মীনের সামনে দাঁড়িয়ে মিন্ মিন্ করে। অর্থাৎ, অবস্থা ভেদে মীনও সিংহ হয়ে উঠতে পারে, সিংহও হয়ে উঠতে পারে মীন।

আসলে, ঋতু যেমন চক্রবৎ পরিবর্তিত হয়, রাশিচক্রও তেমনি আবর্তনশীল। জন্মসূত্রে আমরা যে-রাশিরই জাতক হই না কেন, প্রকৃতপক্ষে আমরা সকলেই সব ক'টি

রাশির অধীন। যে-ব্যক্তি বসন্ত ঋতুতে জন্মেছে তার সারা জীবনটা জুড়েই বসন্ত বিরাজ করে না। সেও বর্ষার জলে সিক্ত হয়, শীতে কম্পমান হয়, গ্রীষ্মে ভাজা-ভাজা হয়। ঋতুর ক্ষেত্রে যা সত্য রাশির ক্ষেত্রেও তা সত্য। যে-জাতক জন্মসূত্রে মেষ সেও কখনো সিংহ, কখনো মকর, কখনো মিথুন, কখনো বৃশ্চিক।

রাশিচক্রে বারোটি রাশিকে মানবচরিত্রের বারোটি গুণ বা স্বভাবের প্রতীক হিসেবে ধরা যায়। অনুগমনপ্রিয়তা ও আজ্ঞাবাহিতায় আমরা মেষ, নির্বুদ্ধিতা ও গোঁয়ার্তুমিতে বৃষ, প্রণয়লিপ্সায় মিথুন, খলতা ও হিংস্রতায় কর্কট, বীর্যে গরিমায় সিংহ, লজ্জা ও ভীরুতায় কন্যা, ন্যায়পরায়ণতায় তুলা, দংশনপ্রিয়তায় বৃশ্চিক, বঙ্কিমতায় ধনু, মাৎস্যন্যায় এবং গৃধ্নুতায় মকর, জড়ত্বে কুম্ভ, আত্মাভিমানে এবং প্রগল্‌ভতায় মীন। নেতাদের ডাকে যারা মিছিলের দৈর্ঘ্য বাড়ায়, জনসভার ভিড় বাড়ায় তারা মেষ, প্রতি সন্ধ্যায় ভিক্টোরিয়া কিংবা রবীন্দ্র সরোবরের ধারে বসে যে-সব যুবক-যুবতী বাদাম কিংবা দূর্বাঘাস চিবোতে চিবোতে প্রেমালাপ করে তারা মিথুন ভাবাপন্ন।

বঙ্গরমণীরা বঙ্কনশীলা, কিংবা বোধকরি বলা যায় বঙ্কণপ্রবণ। বাঁক নেবার জন্যই যেন তারা ওৎ পেতে বসে আছে। কাজেই তারা ধনু। আপনি হয়তো বললেন, 'কই গো, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। সময়মতো যেতে হবে তো।' ব্যাস, ছিলায় টান পড়ল। ধনু বেঁকে উঠল। বলল, 'এত যদি তাড়া থাকে তো একলাই চলে যাও। আমি যেতে পারব না।' তারপর বাঁকা ধনুর চোখা চোখা শর ঝাঁকে-ঝাঁকে এসে আপনাকে বিদ্ধ করতে থাকবে।

উকিল, ব্যারিস্টার, দারোগা, কনস্টেবল—এরা ন্যায়ের তুলাদণ্ড ধারণ করে আছেন। কাজেই পুলিশ বিভাগ এবং আইন বিভাগকে আমরা তুলা রাশির জাতক বলার পক্ষপাতী। অবশ্য, নিন্দুকেরা বলেন, পুলিশ কনস্টেবলদের দৃষ্টি ন্যায়ের তুলার দিকে ততটা নয় যতটা তোলার দিকে, আইন বিভাগেও ন্যায় বলতে এখন মাৎস্যন্যায়। কাজেই, এ দুই বিভাগের প্রকৃত রাশি হল মকর।

সাহিত্যিকরা কুম্ভ-রাশির জাতক তা বলি না, তবে তাঁরা কুম্ভ-সন্ধানী। হাঁড়ি-কলসির খবরের জন্য কাঁধে ঝোলা নিয়ে তাঁরা বেরিয়ে পড়েন অমৃত কুম্ভের সন্ধানে। সে সন্ধানে অমৃত না জুটলেও লেখার উপাদান কিছু জুটে যায়। আর এক জাতের লেখক আছেন যাঁরা পথে বেরোনোর শ্রম স্বীকার করেন না, অন্যের লেখা পড়েই নিজের লেখার উপাদান সংগ্রহ করেন। এঁদেরও আমরা কুম্ভ বলি না, বলি কুম্ভিল কিংবা কুম্ভীলক। বড় লেখকেরা বর্ণচোরা, কেননা যাঁরা রাশি রাশি লেখেন তাঁদের রাশি ঠিক করা মুশকিল। তবে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যখন কেউ কলম ধরেন, তখন তাঁকে শনাক্ত করার সুবিধে হয়। আপন পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্য যাঁরা লেখেন তাঁরা মীন, ব্যঙ্গ কৌতুক লেখার নামে যাঁরা অন্যকে খোঁচা মারেন তাঁরা বৃশ্চিক, সোজা কথা যাঁরা বাঁকা করে

বলেন তাঁরা ধনু। আর যাঁরা প্রকাশক কিংবা সম্পাদকের ফরমাস মতো লেখেন তাঁরা মেষ।

বক্ষ্যমান রচনা পড়ে যাঁরা আমার রাশি জানতে চাইছেন এবার তাঁদের কৌতূহল মেটাই। বলতে লজ্জা হয়, জন্মসূত্রে আমি বৃষ রাশির জাতক। দেখেশুনে একটি মেষ খুঁজে বিবাহ করেছিলাম। শুনেছিলাম, বৃষ আর মেষ রাজযোটক। ভেবেছিলাম, মেষটিকে যে-ভাবে চালাব সেভাবেই চলবে। কিন্তু না, বুঝতে একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল। মেষ রাশির অর্থাৎ একপাল মেষের যা স্বভাব একটি দলছুট মেষের স্বভাব তা নয়। পালের মেষদের মধ্যে যে-অনুগামিতা লক্ষ করা যায় একটি মেষের মধ্যে সে অনুগামিতা নেই। একক মেষ কখনো বৃশ্চিক, কখনো কর্কট, কখনো সিংহ। এমন মেষকে বহন করা আমার নিরীহ বৃষস্কন্ধের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। একটি মেষ নয়, আসলে আমার চাই একপাল মেষ। আমার সমস্যার একমাত্র সমাধান মেষ-হারেম। কিন্তু সেটা দূরঅস্ত্। আমার মেষটি অনিমেষ দৃষ্টি রেখেছে। যাতে আর কোনো প্রস্পেক্‌টিভ মেষ আমার ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে না পারে।

যে-কথা বলার জন্য এতক্ষণ ভূমিকা করছিলাম এবার সে-কথা বলি। রাশিচক্রের প্রথমেই মেষ রাশি কেন, বলুন দেখি? মেষ রাশিকে এ কৌলীন্য দেওয়া হল কেন? তবে কি মনুষ্যসমাজে ছদ্মবেশী মেষের সংখ্যাই বেশি? সম্ভাব্যতার বিচারে এক রাশির জাতক সংখ্যার তুলনায় অন্য রাশির জাতক সংখ্যার কম-বেশি হবার কোনো কারণ নেই। তবু যে মেষ-এর স্থান সর্বাগ্রে এর একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। আসলে, মানুষ যখন একত্রে জনগণ হয়ে ওঠে তখন তার অন্য সব ব্যক্তিক গুণ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তখন ওই যূথবদ্ধ জনতার মধ্যে একটি গুণই প্রকট হয়ে ওঠে। সে গুণটি হল মেষধর্মিতা। কাজেই, জনগণের যদি কোনো রাশি থাকে তবে তা মেষ। সর্বক্ষেত্রে যেহেতু জনগণের দাবিই সর্বাগ্রে বিবেচ্য, তাই এক ডজন রাশির মধ্যে মেষই অগ্রাধিকার পেয়েছে।

জনগণ মেষ, তাই গণতন্ত্র আসলে মেষতন্ত্র। এ সত্য যাঁরা জানেন এবং কাজে লাগাতে পারেন তাঁরাই জননেতা হবার যোগ্য। কাজেই, নেতাদের অন্য নাম মেষপালক।

গণপতির গজমুণ্ড

গণেশ হলেন গণপতি বা গণনায়ক। গণেশ যে-আমলের সে-আমলে গণপতি বলতে বোধকরি রাজাই বোঝাত। এখন রাজতন্ত্র নেই, আমরা এখন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। গণতন্ত্রে আমরা সবাই রাজা, কেননা আমাদের ভোটেই রাজসিংহাসন-তুল্য গদিতে বসার অধিকারী হন আমাদের নেতৃস্থানীয় দাদারা। কাজেই, আজকের গণেশ রাজা নন। এখন গণেশ বলতে জন-প্রতিনিধিদেরই বুঝতে হবে।

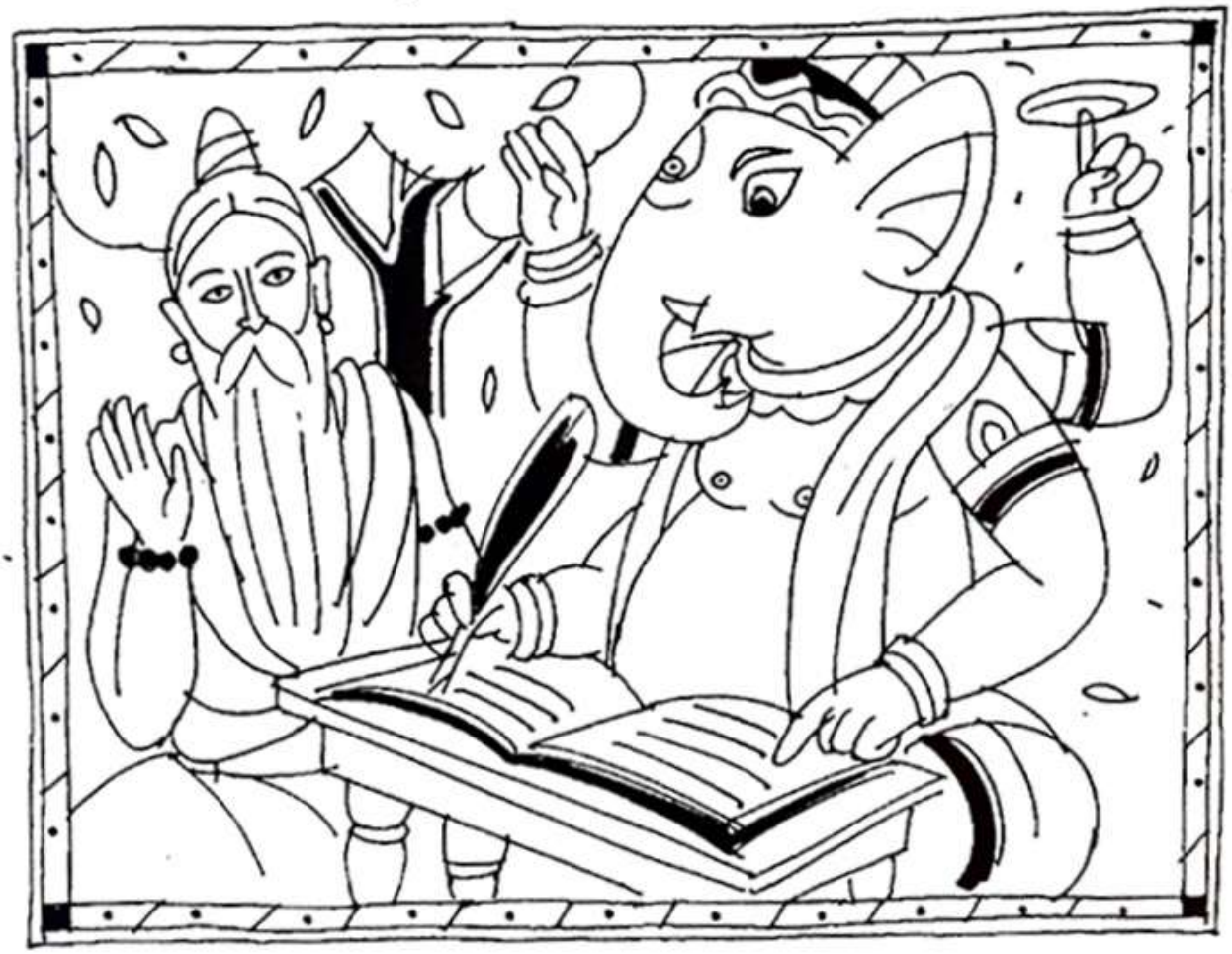

কিন্তু গণেশের গজমুণ্ডের ব্যাখ্যা কী? এ ব্যাপারে শাস্ত্রকারেরা কিছু বলেন না। পুরাণে কেবল পার্বতীপুত্রের মেটামরফসিসের গল্পটাই পাওয়া যায়। মাতুল শনি এসে সদ্যোজাত গণেশের মুখ দেখলেন, আর তাতেই ভাগনের মুণ্ডপাত ঘটে গেল। শনির দৃষ্টি বলে কথা। বিষ্ণু তখন তাঁর সুদর্শন চক্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন একটি উপযুক্ত মুণ্ড সংগ্রহের জন্য। চক্র তাঁর মর্জিমাফিক ঘুমন্ত গজের মুণ্ড কেটে এনেছিল, নাকি চক্রের ওপর বিষ্ণুর 'রিমোট কন্ট্রোল' ছিল—গল্পে তার উল্লেখ নেই। তবে মনে হয় চক্রের প্রতি এ নির্দেশ

ছিল যে, মুণ্ডটা যেন রাজলক্ষণযুক্ত হয়। পুত্র রাজা হোক—পার্বতীই বোধকরি এ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, যে-জাতকের কান লম্বা সে-জাতকের ভাগ্যে রাজসুখের সম্ভাবনা থাকে। সুদর্শন চক্র তাই কোনো সুদর্শন মুণ্ড না বেছে একটি গজমুণ্ড বেছে নিয়েছিল, কেননা কানের দৈর্ঘ্য দিয়ে যদি রাজা নির্বাচিত হয় তবে ঐরাবতের দাবি সর্বাগ্রে। আর একটি ব্যাপারও লক্ষণীয়। গজমুণ্ডের আর একটি রাজলক্ষণ আছে—সেটা হল ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ। মাথার সাইজের তুলনায় হাতির চোখ খুবই ছোট ছোট। বিবর্তনবাদ অনুসারে, কোনো প্রাণী যদি তার কোনো অঙ্গ ব্যবহার না করেই দিব্যি চালিয়ে দিতে পারে তাহলে সে-অঙ্গ ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়। এ যুক্তিতে রাজার চোখ ছোট হবার কারণ বোঝা যায়। শাস্ত্রে আছে, 'রাজা কর্ণেন পশ্যতি'। অর্থাৎ, রাজা চোখে দেখেন না, কান দিয়ে দেখেন। তাঁর গুপ্তচরেরা, তাঁর পার্শ্বচরেরা এবং তাঁর বিদূষকরা তাঁকে যা দেখান রাজা তাই দেখেন। রাজার অধীনে জমিন এতো বেশি যে সর্বত্র গিয়ে সরেজমিনে দেখা রাজার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই চোখ না থাকাটাও রাজার পক্ষে কোনো ডিসকোয়ালিফিকেশন নয়। রাজার চোখ না থাকলেও যে কোনো ক্ষতি নেই তার প্রমাণ মহাভারতেই আছে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন কিন্তু তাতে রাজ্য চালাতে অসুবিধে হয়নি।

সঞ্জয়ের মুখে ধারাভাষ্য শুনে তিনি কুরুক্ষেত্রের সব ব্যাপার-স্যাপারও অনুপুঙ্খ দেখেছিলেন স্বকর্ণে। তাঁর কানের সাইজ সম্পর্কে যদিও মহাভারতে কোনো উল্লেখ নেই, তবু ধরে নিতে পারি, তিনি কানে নেহাত খাটো ছিলেন না।

গণপতিদের চোখ না থাকলেও ক্ষতি নেই. কেননা সহস্র চোখে তাঁরা দেখেন। দেবরাজ ইন্দ্রের সর্বাঙ্গে চক্ষু ছিল—শাস্ত্রে এর কদর্থক ব্যাখ্যা থাকলেও আমার মনে হয় এর একটি প্রতীকী অর্থ আছে। ইন্দ্রের সহস্রলোচনের ব্যাখ্যা হল এই যে, দেবরাজ তাঁর অনুচর গুপ্তচরদের চোখ দিয়ে একই সঙ্গে সহস্র দিক দেখতে পেতেন। আমাদের গণপতিরাও বহুচক্ষুষ্মান। তাঁরাও তাঁদের গোয়েন্দা বাহিনীর সহস্র চোখে একই সঙ্গে বিভিন্ন দিকে নজর রাখেন। কিন্তু সে-কথা এখন থাক। আমরা বলছিলাম গণেশের গজমুণ্ডের কথা। সে-প্রসঙ্গেই আবার ফিরে যাই।

বৃহৎ মস্তকবান হিসেবে গজের খ্যাতি থাকলেও মস্তিষ্কবান হিসেবে তাঁর খুব খ্যাতি নেই। তবে, শাস্ত্রকারেরা ইঙ্গিতে আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন যে, গণেশ নেহাৎ গজমূর্খ ছিলেন না। জ্ঞানগম্যি একটু কম থাকলেও দ্রুতলিপি ও শ্রুতলিপি—এ দুটোতেই গণেশ ছিলেন অত্যন্ত পটু। জ্ঞানবুদ্ধিতে কিঞ্চিৎ খাটো বলেই বেদব্যাস তাকে স্টেনোগ্রাফার পদে বহাল করতে পেরেছিলেন মহাভারত লেখার সময়। গণেশ ভদ্রতার খাতিরে বৃদ্ধ বেদব্যাসের প্রস্তাব নাকচ করতে পারেননি; তবে বলেছিলেন, 'আপনি যদি একটানা বলে যেতে পারেন তাহলেই আমি লিখব। যদি বলতে বলতে থেমে যান তাহলে কিন্তু আমি ইস্তফা দেব।'

বেদব্যাস বলেছিলেন, 'ঠিক আছে। কিন্তু যা লিখবে তা বুঝে লিখবে। না বুঝে লিখতে পারবে না।'